# যে গান বুলেট গান

অমল আকাশ

গদরকে সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার মুম্বাইয়ে। ২০০৪ সালের ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি 'মুম্বাই রেজিস্ট্যান্স' সম্মেলনের মূল মঞ্চের তিনিই ছিলেন প্রধান সঞ্চালক। যাওয়ার আগেই শুনেছিলাম, তিনি অন্ধ্রের কিংবদন্তি সমতুল্য গণসংগীতশিল্পী, যাঁর গান শুনতে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়ে যায়। ফলে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল গদরের পরিবেশনা দেখার। কী এমন জাদু আছে তাঁদের গানে! আমাদের এখানে গণসংগীত তো প্রায় জাদুঘরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

১৯ জানুয়ারি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, দেশ থেকে আসা দলগুলোর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সেদিন সকাল থেকে গদর উপস্থাপনার দায়িত্ব নিলেন এবং চালিয়ে গেলেন রাত নয়টা-দশটা পর্যন্ত। জননাট্য মণ্ডলীর হয়ে নিজেও গান গাইলেন। কিন্তু সেকি গান গাওয়া! এ তো আমাদের গম্ভীরা গানের সাথে মিলে যাচ্ছে। আবার যখন হাসিঠাট্টা-কৌতুক করছেন তখন আমাদের সঙপালার কথাও মনে হচ্ছে। গদর হচ্ছেন মূল শিল্পী, তাঁর সাথে আরো কয়েকজন আছেন, যাঁরা কোরাসে অংশগ্রহণ করছেন, নৃত্য করছেন এবং গদরের সাথে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন। অভিনয় বলতে মূলত কোনো একটা বিষয়ে কেউ হয়তো জোতদারের চরিত্রে ডায়ালগ দিচ্ছেন, গদর মজদুরের চরিত্রে উত্তর দিচ্ছেন। সে সময়কার শারীরিক অভিব্যক্তি তাঁরা অভিনয়ের আঙ্গিকে পরিবেশন করছেন। আবার গদর গানের ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে দর্শকের মুখ থেকে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর বের করে নেবার চেষ্টা করছেন। অথবা কোনো একটা সুর হাজার হাজার দর্শক একসাথে গদরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নিচ্ছেন।

জননাট্য মণ্ডলীর শিল্পীদের মঞ্চের পোশাকও মনে হয়েছে পরিকল্পিত। হাতে লাল পতাকা বাঁধা লাঠি, কাঠের এক পাশে ঝুলিয়ে রাখা একটা কম্বল, খালি গা, হাঁটুর একটু নিচ থেকে পরা সাধারণ ধুতি। অবশ্য যন্ত্রীরা (প্রধানত নাল আর ডাফলি বাদক, তাদের দলীয় পরিবেশনায় গিটার বা স্থানীয় কোনো তারযন্ত্র ব্যবহার করতে দেখলাম না) পরিকল্পিত কোনো পোশাক পরে না। তাঁদের দৈনন্দিন পরিহিত পোশাকেই মঞ্চে হাজির হয়। আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম গদরের উপস্থাপনায়, কারণ তিনি বিভিন্ন দলের পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় ছোটখাটো ফুটবল খেলার মাঠের মতো মঞ্চটার এমাথা থেকে ওমাথা লাফিয়ে-দাপিয়ে, নেচে-গেয়ে, বাকপটুতায়, রঙ্গ-তামাশায় সবাইকে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। পঞ্চান্ন বছরের একটা লোক, যাঁর পেট থেকে বুক অব্দি সেলাইয়ের চিহ্ন, মাত্র ষোলো দিন আগে যাঁর সোমত্ত ছেলেটি মারা গেছে, সেই লোকটা কী করে এসব করছেন! কোথা থেকে পান এমন মানসিক শক্তি? শারীরিক শক্তিই বা কম কিসে! ভাবছিলাম গদর যখন

**পঞ্চান্ন বছরের একটা লোক, যাঁর পেট থেকে বুক অব্দি সেলাইয়ের চিহ্ন, মাত্র ষোলো দিন আগে যাঁর সোমত্ত ছেলেটি মারা গেছে, সেই লোকটা কী করে এসব করছেন! কোথা থেকে পান এমন মানসিক শক্তি? শারীরিক শক্তিই বা কম কিসে!**

নাচের ফাঁকে ফাঁকে লাফ দিয়ে আসমানের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, ঐ রকম কিছু করতে হলে আমি বড়জোর ঘণ্টাখানেক টিকে থাকব। অথচ লোকটা চালিয়ে গেলেন সারাটা দিন! স্যালুট গদর। আমার প্রথম স্যালুট তাঁকে জানিয়েছিলাম সেই মঞ্চের সামনে পঁচিশ হাজার দর্শকের সাথে দাঁড়িয়ে।

২.

যে বছর গান্ধীর মৃত্যু হলো, সে বছর গুমড়ি ভিট্‌ঠল রাও (গদর) এর জন্ম। এভাবেই ছেলের জন্মসালের স্মৃতি মনে ধরে রেখেছেন তাঁর মা লচ্চু মাম্বা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় পাঞ্জাবের কয়েকজন বিপ্লবী একটি দল গড়ে তোলেন সুদূর সানফ্রান্সিসকোতে, যার নাম ছিল 'গদর'। তারা যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন, তারও নাম ছিল 'গদর'। সেই 'গদর'-এর অনুপ্রেরণায় জননাট্য মণ্ডলী তাদের গানের রচয়িতা হিসেবে একটাই নাম ব্যবহার করত–'গদর'। কিন্তু গুমড়ি ভিট্‌ঠল রাও যেহেতু অধিকাংশ গানের নেতৃত্ব দিতেন, ফলে দিনে দিনে সকলে তাঁকেই গদর বলে চিহ্নিত করতে থাকল। এভাবে ভিট্‌ঠল রাও হয়ে উঠলেন 'গদর'।

অন্ধ্র প্রদেশের মেদক জেলার তুপ্রাণ গ্রামে এক দলিত পরিবারে গদরের জন্ম। মা লচ্চু মাম্বা ভূমিহীন খেতমজুরের মেয়ে। দারিদ্র্য তাঁর নিত্যসঙ্গী হলেও গদরের ভাষায়, তাঁর ছিল সীমাহীন গানের খনি। গাঁয়ের নানা আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর গান গাওয়ার ডাক পড়ত। ছোট্টবেলায় গদর ভীষণ মা-নেওটা ছিলেন। আঁচল ধরে ধরে মায়ের সাথে চলে যেতেন নানা অনুষ্ঠানে। মায়ের কণ্ঠ থেকে তুলে নিতেন লোকগান। তাঁর মা ছিলেন তাঁর গানের ইশকুল, প্রথম প্রেরণা। বাবা শেষাইয়া মহারাষ্ট্রে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি ছিলেন আম্বেদকরের চিন্তাধারার অনুসারী। প্রথম জীবনে গদরের উপরও আম্বেদকর চিন্তাধারা প্রবল প্রভাব ফেলে। গদরের বাবা রাজনৈতিকভাবে দলিতদের অধিকার প্রশ্নে সচেতনতার কারণে চাইতেন ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হোক। শেষাইয়া অন্য দলিতদের মতো ছেলে-মেয়েদের দলিত নাম রাখতে চাননি। ছেলে-মেয়ের নাম রেখেছেন সরস্বতী, শান্তা বাঈ, বালা মুনি, নরসিংহ রাও ও ভিট্‌ঠল রাও।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিন্তু এই পরিবর্তন মেনে নিলেন না। গুমড়ি ভিট্‌ঠল রাও স্কুলে ভর্তি হতে গেলে তাঁকে রাও পদবি বাদ দিয়ে শুধু ভিট্‌ঠল নামে ভর্তি হতে হলো। বর্ণপ্রথার তীব্র বৈষম্যপূর্ণ সমাজের মধ্য থেকেই দলিত জীবনকে দেখেছেন ভিট্‌ঠল। ছোটবেলায় দেখতেন ভালো শাড়ি পরে তাঁদের ঘরের মেয়েরা জমিদারের জমিতে কাজ করতে যেতে চাইত না। সাহেব-বাবুদের ছেলেদের ভুল করে 'আরে' 'তুমি' বলে ফেললে, হরিজন ছেলেদের জরিমানা হতো বা পা ধরে ক্ষমা চাইতে হতো।

এমন সামন্ত সমাজেই ভিট্‌ঠলের শৈশব কাটে। তবে পড়াশোনায় ভালো ছিলেন বলে সে অঞ্চলে তিনিই প্রথম কোনো দলিত ছেলে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পেরেছেন। তবে পুরোটা পথ তাঁকে চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে। হাই স্কুলে পড়াকালীনই বাবা মারা গিয়েছিলেন। যা হোক, শেষাবধি তাঁকে যখন তফসিলি জাতির সংরক্ষিত আসনে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে হলো,

তখনো তাঁকে পিছু ধাওয়া করে বেড়িয়েছে বর্ণপ্রথার অপমান। তাঁকে প্রায়ই উচ্চবর্ণের ছাত্রদের কাছ থেকে শুনতে হতো, 'তুমি তো সরকারের জামাই।' অথচ ভর্তি পরীক্ষায় ভিট্‌ঠল ৭৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। অবশ্য কয়েক বছর পর ভিট্‌ঠলের নিজেরই মনে হলো, গরিব দলিত ছেলের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বিলাসিতা মাত্র। তাছাড়া পরিবারের অবস্থাও ছিল খুব শোচনীয়। প্রয়োজন খুব দ্রুত কোনো আয়-রোজগারে ঢোকা।

এই সময় তিনি 'বাপুজি বুর্‌রা কথা পার্টি' নামে একটি গানের দল গঠন করেন। সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের অনুষ্ঠান করলে তাঁরা ৭৫ টাকা সম্মানী পেতেন এবং দলের সবাই ভাগ করে নিতেন। এরপর ভিট্‌ঠল শ্রমিক হিসেবে এক বছর কাজ করলেন হায়দ্রাবাদে বালানগরের একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে। আর বিমলার সঙ্গে বিয়ের আগেই কানাড়া ব্যাংকে যোগ দিলেন করণিক হিসেবে। তবে এ চাকরিও তিনি খুব শান্তিতে করতে পারেননি। '৭৫-এ তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। '৭৬-এ জরুরি অবস্থায় গদরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের পর ছেড়েও দেয়া হয় কয়েকদিনের মধ্যে। কেননা ইতোমধ্যে গদর একজন প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এ ঘটনার জের ধরে সাময়িক অব্যাহতির পরে তিনি আবার চাকরিতে ফিরে আসতে পারলেন '৭৭ সালে। তবে '৮৪ সাল নাগাদ আর পেরে উঠলেন না গদর। তাঁর গানের যাত্রা আর সরকারি চাকরির দায়িত্ব সমান তালে চালানো গেল না। তিনি চূড়ান্তভাবে চাকরিটা ছাড়লেন।

৩.

গ্রাম থেকে ওঠে আসা দলিত সন্তান ভিট্‌ঠলকে কিন্তু হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জীবন আমূল পাল্টে দিয়েছিল। '৬৯-এ গদর যখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র, সেই সময় তিনি পেলেন পৃথক তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ঢেউ। যোগ দিলেন তাতে, আন্দোলনকে বেগবান করতে তৈরি করলেন গানের দল 'বুর্‌রা কথা দল'। এ দল থেকেই তিনি লিখেছিলেন প্রাচীন লোকশৈলীর আঙ্গিকে 'তেলেঙ্গানা গোল্লা সুদুল'। কিন্তু খুব বেশিদিন গদর এই আন্দোলনের চরিত্র, নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি 'বাপুজি বুর্‌রা কথা পার্টি' নামে গানের দল করে নেতাদের ব্যঙ্গ করে গান লিখেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন গদর পরিচিত হলেন মার্ক্সবাদ-মার্ক্সবাদী লেখকদের সাথে। শ্রী শ্রী চেরাবান্দারাজু তাঁকে ভীষণ আর্কষণ করলেন। তাঁর জীবনের এ সময়টা নিয়ে গদর নিজে একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '১৯৬৮-৬৯-এ তখন আমি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। শ্রীকাকুলামের কৃষক বিদ্রোহও তখন তুঙ্গে। সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর মতো বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই এলাকায় আদিবাসীরা, যাঁরা শত শত বছর ধরেই ঐখানে বাস করছেন, তাঁরা তাঁদের জমি দাবি করলেন। তৎকালীন সিপিএম থেকে বিভক্ত সিপিআই (এমএল)-কে সমর্থন জানালেন। এই ঘটনায় দারুণভাবে প্রভাবিত হলাম। একজন ছাত্র এবং একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমিও উন্মুখ ছিলাম শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করতে; শ্রীকাকুলামের আন্দোলনের ফলে আমার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল। এই সময়ের ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আমিও তাতে অংশগ্রহণ করি; ক্রমে এই প্রবাহের মধ্যে মিশে যাই।'

১৯৬৮-তে সেকেন্দ্রবাদের চলচ্চিত্র নির্মাতা নরসিংহ রাও 'আর্ট লাভার্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। গদর যোগ দেন এই 'আর্ট লাভার্স'-এ এবং 'মা ভূমি' নামে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের উপর নির্মিত চলচ্চিত্রে একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেন। নরসিংহ রাওয়ের 'রঙ্গলকলা' চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেন। 'ওরি রিক্সা' নামক চলচ্চিত্রের গীতিকার হিসেবে তিনি 'নন্দী পুরস্কার'ও পেয়েছিলেন। সে যা-ই হোক, চলচ্চিত্র তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল না, ফলে তাঁরই উদ্যোগে 'আর্ট লাভার্স' অ্যাসোসিয়েশন রুপান্তরিত হলো 'জননাট্য মণ্ডলী'তে। এই সংস্থা গঠিত হবার পরেই ভিট্‌ঠল জননাট্য মণ্ডলীর মুখ্য শিল্পী হিসেবে গান করে চলেছেন আজ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে তিনি সিপিআই (এমএল) পিপলস ওয়ারের সাথে যুক্ত হয়েছেন। বলা চলে, 'জননাট্য মণ্ডলী' গড়ে উঠেছিল 'গণনাট্য সংঘের কনসেপ্টকে মাথায় রেখেই। জনযুদ্ধের সাংস্কৃতিক মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন 'জনাম' (জননাট্য মণ্ডলী)-এর শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা।

**গদরের সংগ্রামী জীবনের কিছু ঘটনা**

১৯৮৫-এর ১৭ জুলাই অন্ধ্রের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল করম চেড়ুতে ছয়জন দলিতকে হত্যার ঘটনা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'করমচেড়ু আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শিবির থেকে দলিতদের নির্ভয়ে নিজ বাসস্থান করমচেড়ুতে ফেরত পাঠানো এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবি আদায়। গদরসহ পুরো 'জননাট্য মণ্ডলী' এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর চিরালীতে সারাজ্যের দলিতরা যোগ দিলেন সমাবেশে, যার উদ্বোধক ছিলেন গদর। রাজ্য সরকার গদরকে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল। এমনকি তাঁর বাড়িতেও পুলিশ ঘন ঘন হেনস্তা করতে থাকল। সেকেন্দ্রবাদ বেঙ্কটাপুরানের বাড়ি থেকে তাঁর ঢোল, নূপুর, কাঠের বন্দুক (যা জনামের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো), তাঁর বইপত্র–সব নিয়ে যায় পুলিশ। শুধু গদর কেন, মাওবাদী সকল লেখক-বুদ্ধিজীবীকে ধরে ধরে অত্যাচার করতে লাগল সরকার। এমনকি অন্ধ্রে সিভিল লিবার্টিজের সহ-সভাপতি ড. রমানাথনকে প্রকাশ্যে খুন করা হলো। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে গদর আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁকে ধরতে না পেরে সরকার তাঁকে রামনগর কেসের আসামি করে দিল। গদরের অপরাধ কী? জানা গেল, পুলিশ বলছে, 'রামনগরে সিপিআই (এমএল)-এর যেসব লুকানো আস্তানা তারা খুঁজে পেয়েছে, তার সবখানেই পাওয়া গেছে গদরের গানের বইয়ের কপি।' পুলিশ মনে করে, ওর গানের প্রতিটি শব্দই বোমার মতো বিপজ্জনক। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার এই মামলায় অবশ্যই গদরকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু গদর ততক্ষণে চলে গেছেন জঙ্গলে–আত্মগোপনে। এবং '৯০-এ অন্ধ্রে সরকার পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত আত্মগোপনে হেঁটেছেন প্রায় ৪০ হাজার মাইল। কখনো জেলে সেজে, কখনো বা মেষপালকের বেশে অন্ধ্রের বিভিন্ন প্রান্তে, দণ্ডকরণ্যে। বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে থেকে থেকে তাঁদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে বেঁধেছেন প্রতিবাদী গান।

১৯৯০ সালের অন্ধ্রের সরকার পরিবর্তনের পর গদর যখন পুনরায় ফিরে এলেন প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে, তখন জননাট্য মণ্ডলীর ১৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজ মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২০ ফেব্রুয়ারির সেই অনুষ্ঠানে প্রায় দুই লাখ মানুষের জমায়েত হয়েছিল গদরের গান শোনার জন্য। সাড়ে চার বছর বাদে জননাট্য মণ্ডলীর প্রকাশ্য অনুষ্ঠান, ফলে প্রতিটি অনুষ্ঠানেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত গদরের গানের টানে।

কিন্তু নতুন সরকারও গদরের গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তায় এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনায় অতি শীঘ্রই চিন্তিত হয়ে পড়েন। '৯০-এ সারা ভারত সাংস্কৃতিক লীগের অংশ হিসেবে জননাট্য মণ্ডলী দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রচারণার কর্মসূচি হাতে নেয়। কর্ণাটক সরকার তাদের অঞ্চলে 'জননাট্য মণ্ডলীর অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, ৬ অক্টোবর মধ্য প্রদেশের ভিলাইতে পুলিশ গদরসহ জনম-এর ২৫ জন এবং কবি ওয়র ওয়র রাওকে বারো ঘণ্টা আটকে রেখে পুলিশ ভ্যানে করে অন্ধ্রের সীমানায় ছেড়ে দিয়ে আসে। মুম্বাই নাগপুরে গদরের অনুষ্ঠানের উপর প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপর মুম্বাই হাইকোর্ট সে নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে দিলেও ১৩ ফেব্রুয়ারি যখন অনুষ্ঠান করতে যায়, তখন জনাম এর শিল্পীদের উপর পুলিশ এলাপাথাড়ি লাঠি চালায় এবং তাদের ধরে জোর করে অন্ধ্রের ট্রেনে তুলে দেয়।

১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ গদরের জীবনে ঘটে একটি দুঃখজনক ঘটনা। গদরকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। কারণ হিসেবে শুধু জানা যায়, বেশ কিছু বিষয়ে সিপিআই (এমএল) পিপলস ওয়ারের সঙ্গে গদরের মতবিরোধ চলছিল। তবে খুব দ্রুতই গদর আত্মসমালোচনা করেন এবং দলও গদরের ব্যাখ্যা মেনে নেয়। তিনি পুনরায় সদস্যপদ ফিরে পান। তবে এত বড় ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এ ঘটনার রেশ চলতে চলতে রাজনৈতিক মহলে ঘটে যায় আরো একটি বড় ঘটনা। ১৯৯৬-এ তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর ওপর হামলা হয়। মন্ত্রী প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু অনেকের মতো গদরের উপর শুরু হয় লাগাতার মানসিক নির্যাতন। তাঁকে দিনের পর দিন টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলল কখনো 'গ্রীন টাইগার' নামে, কখনো বা অজ্ঞাত পরিচয়ে। এমনকি সংবাদমাধ্যমও এ হামলার কারণ জানতে গদরকে জেরা করতে ছাড়েনি। গদর উত্তরে বলেছেন, 'পিপলস ওয়ারের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথাবার্তা বন্ধ হওয়াই এ রকম অঘটনের কারণ।' ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা চলল পুরো বছরজুড়েই। এবং '৯৭-এর ৬ এপ্রিল সত্যি সত্যিই সেই দিনটি উপস্থিত হয়েছিল গদরের জীবনে। কিন্তু তার আগে অসংখ্য জায়গায় গদর প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে চিঠি দিয়েছিলেন। বিধানসভার নির্বাচিত সব প্রতিনিধিকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন, একাধিকবার সংবাদমাধ্যমকে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিমলা টেলিফোনে সেই সব হুমকির রেকর্ড সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছিলেন। সেসব হুমকির একটা নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে, 'অক্টোবর ৫ গদওয়াল থেকে টেলিফোনে ভীতি প্রদর্শন। খবর দেয়া হলো যে গদরকে হত্যার জন্য দল তৈরি হচ্ছে। অক্টোবর ৬ ওয়ারঙ্গল থেকে ভীতি প্রদর্শন...শেষ, মৃত্যু হতে যাচ্ছে তোমার।' এভাবে তথাকথিত সবুজ বাঘেরা ভয় দেখাল প্রতিদিন।

১৯৯৭-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পিডব্লিউজির হায়দ্রাবাদ শহর কমিটির সম্পাদক সুরেশ ও সদস্য রাজুকে পুলিশ গুলি করে মারে। তারপর নরসাপুরের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে তথাকথিত 'এনকাউন্টার'-এ মৃত্যুর গল্প প্রচার করে। খবর পেয়ে গদরসহ গণসংগঠনের কর্মীরা দ্রুত সেখানে পৌঁছেন। তাঁরা গিয়ে পুলিশের কাছে দাবি জানান, পোস্টমর্টেম ছাড়া লাশ কিছুতেই পোড়াতে দেবেন না। এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার গ্রামবাসীরা পুলিশকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে পুলিশ বাধ্য হয়ে তৃতীয় দিনে লাশ গদরের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

এর পরের মাসেই পুলিশ পিপলস ওয়ারের ডেপুটি স্কোয়াড লিডার এলাঙ্কি মারৈয়াকে খুন করে রচকাণ্ডা পাহাড়ে ফেলে রাখে। সেখানেও গদর ছুটে যান। জড়ো হয় হাজার হাজার গ্রামবাসী। কিন্তু এবার পুলিশ আগেভাগেই গদর ও তাঁর সাত সহযোদ্ধাকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে রাখে, যাতে গতবারের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে না পারে তারা। যা হোক, ২৮ মার্চ নালগোণ্ডা আদালত গদর ও তাঁর সঙ্গীকে জামিন দেয়। কিন্তু গদর জামিন নিতে অস্বীকার করেন। তিনি দাবি জানান, গণতান্ত্রিক রীতিবিরোধী এই মিথ্যা মামলা থেকে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। অবশেষে গদরের দাবি না মেনে তাঁকে হায়দ্রাবাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দিলে তাঁর মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। এবং আন্দোলন অবশেষে জয়ের মুখ দেখে। গদরকে সরকার নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। আর জেল থেকে বেরিয়ে কয়েকটি গণসংগঠনকে নিয়ে 'এনকাউন্টার'-এ শহীদদের পোস্টমর্টেম এবং লাশ আত্মীয়-স্বজনের হাতে নিয়মমতো তুলে দেয়ার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন, যার আহ্বায়ক হন তিনি নিজেই।

১৯৯৭ সালের ৬ এপ্রিল, অবশেষে এলো সেই দিন, যে দিনটির জন্য সবুজ বাঘেরা লাগাতার হুমকি দিয়ে আসছিল। গদর ঘরে বসে টিভি দেখছিলেন, তখন সন্ধ্যা ছয়টা-সাড়ে ছয়টা, বাড়ির বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল, চারজন নেমে এলেন। এঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে কথা বললেন গদরের স্ত্রী বিমলার সাথে। জানালেন, ওয়ারঙ্গল থেকে এসেছেন, নকশালরা তাঁকে পুলিশের চর সন্দেহে চাষবাস করতে দিচ্ছে না। এ ব্যাপারে গদরের সহায়তা চায়। এ আলাপ চলতে চলতে বাকি তিনজন কিন্তু ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে। ঢুকেই তাদের একজন গদরকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি ছুড়ল। ঘটনার এমন আকস্মিকতায় চিৎকার করে ওঠেন স্ত্রী বিমলা। গদরের ছেলে-মেয়েরা অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আততায়ীরা আবার গদরকে লক্ষ্য করে গুলি করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। মোট পাঁচটা গুলি লাগে গদরের শরীরে–একটা বুকের ডান দিকে, দ্বিতীয়টি বাম জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে, তৃতীয়টি পেটে, চতুর্থটি ডান কাঁধের পেছন দিকে আর পঞ্চমটি মেরুদণ্ডের কাছাকাছি। কিছুটা সৌভাগ্য বলতেই হবে গদরের যে একটা গুলি হৃৎপিণ্ড ঘেঁষে বেরিয়ে যায়, অন্যটি ফুসফুসের পাশ দিয়ে, আর একটি মেরুদণ্ডের পাশে। এর যে কোনো একটা গুলিই যথেষ্ট ছিল তাৎক্ষণিক গদরের জীবন কেড়ে নেবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদর বেঁচে গেলেন। কিন্তু ডাক্তাররা মেরুদণ্ডের কাছে আটকে পড়া গুলিটি বের করে আনাটা বিপজ্জনক বলে সেটিকে অপসারণ করেননি, যে গুলিটি দেহের ভেতর বহন করে এখনো বেঁচে আছেন, গান গাইছেন গদর। গদর যখন হাসপাতালের ওটিতে জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়ছেন, হাসপাতালের বাইরে তখন তাঁবু খাটিয়ে আস্তানা গেড়েছে সমর্থকরা। সারা শহরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। সকলেরই অভিযোগের তীর ছিল পুলিশ তথা মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। ওদিকে হাসপাতালের দেয়ালে স্লোগান চলছে, 'বুলেট দিয়ে কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। গানের হৃদয় বুলেটে বিদ্ধ করা যায় না।' অবশেষে মৃত্যুর সাথে লড়ে বিজয়ী হয়ে, আততায়ীদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন গদর।

ইতোমধ্যে আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলো অন্ধ্রের। এবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন কংগ্রেসের ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি। তিনি ক্ষমতায় এসে আবার উদ্যোগ নিলেন পিপলস ওয়ারের সাথে শান্তি আলোচনায় বসতে। অবশেষে ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে সিপিআই (এমএল) পিপলস

ওয়ারের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। পিপলস ওয়ারও কোনো আক্রমণ করল না। অন্তত ছয় মাস অন্ধ্রে কোনো আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ঘটনা ঘটল না, যা অন্ধ্রে এর আগের ১৫ বছরের ইতিহাসে ছিল বিরল।

২০০৪-এর ২১ সেপ্টেম্বর সিপিআই (এমএল) পিপলস ওয়ার এবং এমসিসিআই একত্রিত হয়ে তৈরি হলো সিপিআই (মাওবাদী)। এই দলের পক্ষ থেকে সরকারের সাথে আলোচনায় বসার জন্য যে প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়, সেখানে ওয়র ওয়র রাও, জি কল্যাণ রাওয়ের সাথে গদরও ছিলেন। কিন্তু সেই শান্তি আলোচনা আবার ভেস্তে যায়। ফলে সরকার ২০০৫-এর আগস্টে দলটিকে আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯ আগস্ট সরকার বাকি দু'জনকে গ্রেফতার করলেও গদরকে গ্রেফতার করল না, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ৪টি মামলা ঠুকে দেয়া হলো। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে অবিরাম টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি শুরু হলো আবার। বাড়ির চারদিকে পুলিশ পাহারা বসল। তাঁর স্বাভাবিক চলাফেরা হয়ে উঠল দুর্বিষহ। এমনকি অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ির টেলিফোন বন্ধ করে দিলেন তিনি, কেননা ফোন মানেই মৃত্যুর হুমকি। তবে এর কোনো কিছুই গদরকে দমাতে পারেনি। যেখানেই 'এনকাউন্টার' হয়েছে, তিনি ছুটে গেছেন সহকর্মীর লাশ উদ্ধারের জন্য। প্রতিবাদ করেছেন। পত্রিকায় লিখেছেন, টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, গান করেছেন গেরিলা কায়দায়। এমনও হয়েছে, কোনো কোনো গণসংগঠনের সভায় কেউ জানত না গদর গান গাইতে আসবেন। তিনি হঠাৎ মঞ্চে এসে গান করে আবার পুলিশ ফোর্সের উপস্থিতির আগেই চলে গেছেন অন্য কোথাও।

**জননাট্য মণ্ডলীর গান**

জননাট্য মণ্ডলী সংগীত, নৃত্য, নাটক–সব ধরনের আঙ্গিকে অনুষ্ঠান করলেও গানই ছিল তাদের প্রাণকেন্দ্র। রগলজন্ডা বা লাল পতাকাতে সংকলিত হয়েছে প্রায় তিনশ' গান। ১৯৭৮ সাল থেকে জননাট্য মণ্ডলীর গানের বই বিক্রি হয়েছে কয়েক লাখ কপি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অডিও ক্যাসেটও বিক্রি হয়েছে লাখ লাখ। আইনি কি বেআইনি পর্যায় সব সময়ই গান তাঁদের হাতিয়ারের মতো কাজ করেছে। গদর বলছেন, "দীর্ঘকাল যুদ্ধের সময় গানের হাতিয়ারের সাহায্যে শত্রুর উপর কিভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন, এ বিষয়ে সব সময় চিন্তা করা উচিত। প্রতিটি শহীদের রক্ত থেকে একটি 'রক্তিম গান' লিখে প্রত্যেক ঘরে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে এই গান শোক কমিয়ে আনবে, ধৈর্য এনে দেবে এবং সংগ্রামের গল্প বলবে। শহীদের রক্ত যে ব্যর্থ হবে না, গান এই ভরসা দেবে। শুধু তা-ই নয়, সে এও বলবে যে আমি কেবল গানই নয়, শোকের বিরুদ্ধে তাক করা বন্দুকের গুলি। জননাট্য মণ্ডলীর গান এই সত্য প্রমাণ করেছে। এ জন্যই বলছি, গান আজ আমাদের শিখারূপ, আমাদের হাতিয়ার।"

শুধু জননাট্য মণ্ডলী কেন, অন্ধ্রের জনগণ কেন, সরকার-প্রশাসনও মনে করত, গদরের গান বুলেটের মতো শক্তিশালী। তার অজস্র উদাহরণ থেকে একটা ঘটনা উল্লেখ করা চলে। একবার অন্য এক রাজ্যে গান গাইতে গিয়েছেন গদর। সেখানে অফিসার ও পুলিশরা মিনতি করল, 'বাবা, তোমার বুলেট আমাদের উপর ছুঁড়তে হবে না। তোমার গান-গুলিই যথেষ্ট। এসব গান শোনার পর জনগণ আমাদের দিকে বন্দুক তাক করবে, দয়া করে চলে যাও।'

পুলিশের কেন এত ভয়? গদরের গান কী করে অন্ধ্রে এত শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হলো? যে গানের শিল্পমান নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, যে গানে আহামরি কোনো যন্ত্রানুষঙ্গ বাজে না, যে গানে সুরের মায়াজালে মধু ঝরে না, বরং যেন রুক্ষ পাথরের গায়ে গায়ে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গ। কী জাদু আছে গদরের গানে? গণসংগীত তো আরো অনেকেই গেয়েছেন, কিন্তু এর আগে আর কোথায় শুনেছি যে গণসংগীত শুনতে দুই লাখ লোকের সমাবেশ ঘটেছে! কিসের শক্তি লুকিয়ে আছে জননাট্য মণ্ডলীর গানে। এর উত্তরে গদর বলেন, "জননাট্য মণ্ডলীর যে সভ্যরা আমার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করেন, তাঁরা কেউই গান শিখে গান করছেন এমন নয়। শ্রমজীবী জনতার হৃদয়ের স্পন্দন হলো আমাদের সংগীতে 'কাদিগিনি তোম্' বা 'কিটতাকি তোম্' যা আমরা শিখিনি। আমরা যা বাজাই সে শুধু ঢোল-তবলা নয়, সে হলো মানুষের বুকের আওয়াজ। আমাদেরকে সংগীতের কোনো মিউজিক কলেজ ডিগ্রি দেয়নি, কোনো সংগীত সংস্থা প্রমাণপত্র দেয়নি...নিঃস্ব জনসাধারণের আর্তনাদই আমাদের গানের প্রাণ।"

নিঃস্ব জনসাধারণের আর্তনাদকে সাংগীতিক ভাষা দিতে, গদর অবশ্য অবশ্যই বেছে নিয়েছেন জনসাধারণের পরম্পরাগত লোকশিল্পকে। ওগু কথা বীথি ভাগোতম, তেলেগু, নৃত্যনাট্য–যাতে নাচ, গান, সংবাদের মাধ্যমে গল্প বলা হয়, য়েল্লমা কথা (স্থানীয় দেবীদের মহিমাকথা) আর এসব নিয়েই গড়ে ওঠে 'রায়তুকুলী বিজয়ম' (মজুর কৃষকের জয়) জননাট্য মণ্ডলীর পরিবেশনা। বুর্‌রা কথা জমকুল কথা এবং ওগু কথা–এসব শৈলীতে তিনজনের ভূমিকা থাকে। দার্শনিক, জোকার ও দর্শক। অন্ধ্রে কথাশৈলী ভীষণভাবে জনপ্রিয়। গদর এই শৈলীগুলোকে বেছে নিয়েছেন এবং আঙ্গিক ঠিক রেখে লড়াই-সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়কে যুক্ত করে নিয়েছেন। গদর বলছেন, 'কৃষি বিপ্লবের প্রচারের জন্য গান গাই। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পাথর ভাঙছেন। তাঁদের গানও এক এক ঘণ্টার মতো হয়ে থাকে। আমরা শ্রম আর গানের সম্পর্ককে মনে রেখে বিপ্লবী গান রচনা করি।'

এখানে প্রসঙ্গক্রমে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে, গদররা তাঁদের যে ধরনের লোকশৈলীগুলো ব্যবহার করেছেন তার সাথে চরিত্রগত এমনকি আঙ্গিকগত মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের পালাগান, গম্ভীরা কিংবা সঙপালায়। এবং আমাদের এই লোকশৈলীগুলোও আমাদের গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের বিপ্লবী সংস্কৃতির লড়াইয়ের ময়দানে সেগুলোকে গদরের মতো সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও লোকশৈলীগুলো বিলুপ্তির পথে হাঁটলেও, আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমাদের দেশের প্রতিবাদী গানের দলগুলো এখনো সেই লোকশৈলীগুলোতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নতুন বিষয়ের সাথে নতুন উপস্থাপনার সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে। গদরের গানের শ্রোতারা অধিকাংশই অন্ধ্রের নিপীড়িত মজদুর শ্রেণির, সামন্ত শোষণ সেখানে আমাদের দেশের তুলনায় নিশ্চয়ই প্রবল, ফলে সেখানে গদর অনেক বেশি সফল হয়েছেন লোকশৈলীর সেতু বেয়ে বিপ্লবের বার্তা শোষিতের কাছে পৌঁছে দিতে। ফলে তাঁদের গানের কথা হয়ে উঠেছে সোজাসাপটা গল্পপ্রধান। এজন্য অবশ্য কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন গদরের গানের সাহিত্য মান নিয়ে। এর জবাবে গদর বলেন, 'আমাদের সাহিত্য জনগণের নাড়ির স্পন্দন শোনা প্রাণবন্ত সাহিত্য–জীবন্ত গান। তা জীবননদীর মতো। আপনাদের পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, জনগণের ভাষায়, জনগণের সুরে গাওয়া হতো বলেই সুরক্ষা পেয়েছে, টিকে আছে। নইলে এইসব লিখিত গ্রন্থ শুধু পণ্ডিতদের জন্যই থেকে যেত। আমাদের সাহিত্য একটি স্পষ্ট ধারণার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সাহিত্য। এটি মেহনতি মানুষের সাহিত্য। এই লক্ষ্যেই আমাদের সাহিত্য

এবং শিল্পগুলো এগিয়ে চলে...আমাদের সাহিত্য আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যয়ন করতে যাঁরা উৎসুক তাঁরা যদি উপরের কথাগুলো মনে রাখেন তাহলে সমালোচনার মুখোমুখি হতে আমরা সব সময়ই প্রস্তুত।'

গদরের জবাবের রাস্তা ধরেই অবশ্য একথা বলা চলে যে, তাঁদের গান যতটা মজুর শ্রেণির, ততটা মধ্যবিত্তের নয়। যদিও তারা নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের সচেতন অংশের আত্মদানের কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁদের গানে। কিন্তু জননাট্য মণ্ডলীর গানে মূলত অধিকাংশ কৃষক-মজুরের গান, দলিত আদিবাসী জীবনসংগ্রামের গান। আর তার রাজনৈতিক কারণও খুবই স্পষ্ট, গদর বলছেন, 'জননাট্য মণ্ডলীর বেশির ভাগ গানই খেতমজুরদের। আমাদের দেশে এরাই জনসংখ্যাগরিষ্ঠ। জমির উপর নির্ভর করে যেহেতু বিপ্লব দাঁড়াবে, ফলে জননাট্য মণ্ডলীর গানের বই কৃষি বিপ্লবের প্রচারমাধ্যম হিসেবেই জন্ম নিয়েছে।'

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে গদর তথা জননাট্য মণ্ডলী তাদের রাজনৈতিক দলের মাতদর্শের উপর ভিত্তি করেই তাদের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। তথাপি ২০০৪ সালের মুম্বাই রেজিস্ট্যান্সে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের গানে অনেকটাই উপেক্ষিত। অবশ্য আমাদের দেশে বর্তমানে যে মাত্রায় মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে, অন্ধ্রের বাস্তবতা সেটি নাও হতে পারে। অন্যদিকে আমাদের দেশে বিশ্বায়নের উন্নয়নের তোড়ে গ্রাম-শহর মিলেমিশে খিচুড়ি সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষক প্রতিদিন দলে দলে শহরে আসছে। রূপান্তরিত হচ্ছে গার্মেন্টসের অস্থায়ী শ্রমিক, রিকশাচালক অথবা অন্য কোনো দিনমজুরে। এই যে রূপান্তরিত শ্রমজীবন, তার সাংগীতিক ভাষা দেবে কে? সস্তা সিনেমার গান, ভোগবাদী মিউজিক ভিডিওর ফুটপাতের সিডি? হিন্দি প্লেব্যাক সং? এই সবকিছু কি শ্রমিকের জীবন, জীবনের দর্শনকে ফুটিয়ে তুলছে, নাকি তাকে তার আপন জীবন থেকে অনেক অনেক দূরে ঠেলে দিচ্ছে? কে তাকে জীবনের দিকে টেনে আনার গান শোনাবে? বাংলার সেই গদর কই? কিংবা কিভাবে একজন গদরের জন্ম হয়, যদি না সে সেদেশে জনগণের মুক্তির রাজনীতির বিকাশ না ঘটে?

যা হোক, জননাট্য মণ্ডলীকে এ ধরনের সংকটে পড়তে হয়নি। তাদের লাগাতার সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শহীদের যত লক্ষ হাজার রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়েছে, অরণ্য-পাহাড় কিংবা রাজপথে ততই তাদের গান আরো স্পষ্ট তীক্ষ্ণ হয়েছে দিনে দিনে। তবে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁরা নিজেদের প্রতিদিন ভেঙেছেন, গড়েছেন, সংগ্রামের নয়া কৌশল বাতলে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত ধারার বামপন্থীদের দ্বারা সমালোচিত তাদের একটি সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে পূজা-পার্বণের গানের আয়োজনে তাদের অংশগ্রহণ। গদর তথা জননাট্য মণ্ডলীর শিল্পীরা বিভিন্ন পূজার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে গান গাইতে যেতেন। এ বিষয়ে গদর বলেন, "বিপ্লবের জন্য, দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্য সংগ্রামরত আমাদের জনগণের উৎসব পূজা-পার্বণে উপস্থিত থেকে তাদের মধ্যে বিপ্লব সম্পর্কে চেতনা আনতে হবে। এর বিপরীতে তাতে অংশগ্রহণ না করে তা থেকে দূরে দূরে থেকে 'টাচ মি নট' মানসিকতাগ্রস্ত হয়ে তাদের ভুলগুলো যদি জনগণকে দেখাই

**আমাদের এই লোকশৈলীগুলোও আমাদের গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের বিপ্লবী সংস্কৃতির লড়াইয়ের ময়দানে সেগুলোকে গদরের মতো সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।**

তাহলে আমরা তাদের শত্রু হয়ে যাব। কমিউনিস্টরা ভগবানকে গাল দেয়- এই ধরনের বুর্জোয়া প্রচার তারা বিশ্বাস করতে থাকবে। ... তেলেঙ্গানা এলাকায় শ্রীরাম নবমী, গণেশ চতুর্থী, মহা শিবরাত্রি পর্বের সময় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ... সেই সময় অল্লুরি সীতারাম রাজুর (ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যিনি শহীদ হয়েছিলেন) বুর্‌রা কথা আমরা করি। শুধু নামেই বুর্‌রা কথা, গানগুলো সব আমাদেরই গান। জনগণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভালো হয়েছিল।

অন্য আরেক জায়গায় একাত্মকতা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমরা একটা গান গাই–

তুমি সত্যকে জানো এ মজদুর ভাই
তুমি কোমর বেঁধে এগোও রে কিষান ভাই
ভগবান তুমি বানিয়েছ, মন্দিরে সাজিয়েছ
শব বহন করেছ তুমি, আমার ভাই
তুমি রথ টেনেছ, আমার ভাই
ভগবানের দর্শনের জন্য যখন
মন্দির গেলে তুমি, আমার ভাই
মন্দিরে ঢুকতে দেয় না কেন তোমায়, আমার ভাই
মরদ : যজ্ঞ থেকে বড় যজ্ঞ হবে
একাত্মকতার যজ্ঞ হবে
সেখানে চলো
গনুগা ফুলওয়ালী গুম্মা (মেয়ে) প্রিয়া আমার
মেয়ে : কোন যজ্ঞের কথা বলছ প্রিয়
ঐ পূজাস্থলে যেতে হবে না
এখন ফসল কাটতে হবে জমিতে

এইভাবে যখন একাত্মকতা যজ্ঞ হচ্ছিল, তখন জনগণের মধ্যে চেতনা বাড়ানোর জন্য এই গানটি লেখা হয়েছিল। জনগণের পথে চলেই, জনগণের স্বীকৃতি নিয়ে ভগবানেরও মুখোমুখি হওয়া যেতে পারে, এই গানে আমাদের সেই অনুভব হয়েছিল।"

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে আমাদের চারণ শিল্পী মুকুন্দ দাসের কথা, যাঁদের অভিজ্ঞতার কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছি। যে মঞ্চে পূজার আয়োজনের অংশ হিসেবে হতো যাত্রাপালা, সেই একই মঞ্চে হয়েছে স্বদেশি আন্দোলনের গান। বোধ করি সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের এইসব পুরনো রাস্তা নিয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা করা উচিত।

গদর যথার্থই বলেছেন জনগণের পথে চলেই জনগণের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হয়। আর সেই স্বীকৃতি, সেই ভালোবাসার শক্তির উত্তাপ কেবলমাত্র জনগণের শিল্পীদের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব। আত্মগোপনের সময় একবার গদররা গড়চিরোলীর জঙ্গলে লুকিয়েছিলেন। সারা জঙ্গল পুলিশে ঘিরে ফেলল। গদর তখন ছিলেন জেলেদের বেশে। পুলিশ তাঁদের খুঁজছিল। তখন গদরদের কাছে কোনো খাবারই অবশিষ্ট ছিল না। সেই সময় আশপাশের গ্রামের মহিলারা গর্ভবতী সেজে কাপড়ের তলায় পেটে রুটি বেঁধে নিয়ে আসতেন গদরদের জন্য।

আর তার প্রতিদান হিসেবে গদরও কোনো দিন জনগণের সাথে বেইমানি করেননি। রাষ্ট্রীয় ভাড়াটে বাহিনীর গুলিও তাঁকে স্তব্ধ করতে পারেনি কোনো দিন। মেরুদণ্ডের কাছাকাছি একটা বুলেট শরীরে বহন করেই এখনো গান গেয়ে যাচ্ছে বীরদর্পে। গান লেখা ও গাওয়া শুরু করেছেন ১৫ বছর বয়স থেকে, এখন তিনি ৬৫ বছরের। ইউটিউবের বদৌলতে ২০১৩ সালের তাঁর একটা ভিডিও দেখলাম, তিনি গাইছেন, এখনো গাইছেন, হাতে লাল পতাকা বাঁধা লাঠি, কাঁধে কম্বল, বয়সের ভারে লম্ফঝম্প কিছুটা কমেছে বলে মনে হলো, কিন্তু গলার তেজ চোখে-মুখের প্রকাশভঙ্গিমা কে কমাতে পারে? বয়স? সে

তো শরীরের ধর্ম। প্রকৃত বিপ্লবীর তো বার্ধক্য আসে না। যারা অবসরে চলে যায়, তারা স্মরণসভায় হারানো দিনের জাবর কাটে। আর গদরের মতো আজীবন সংগ্রামী শিল্পীরা তীক্ষ্ণ সুরে পাথর সময়কে কাটেন, কেটে কেটে পৌঁছে দেন জনতার প্রবহমান স্রোতে। এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যদি পুলিশ আপনাকে আবার গ্রেফতার করে, নির্যাতন করে, তখন কী করবেন? গদরের উত্তর ছিল, 'মানুষ যখন কোনো ভালো কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, তখন মৃত্যুর ভয়ে সে আর ভীত থাকে না। যদি ওরা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাহলেও আমি আমার গান গাইব। যদি তারা আমার কণ্ঠরোধ করে, আমি হাত দিয়ে তালি বাজাব। যদি আমার হাত কেটে দেয়, তাহলে পায়েই বোল তুলব। যদি আমার পাও কেটে নেয়, তবে আমার শরীরকেই জমিতে নাচাব। যদি তারা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলায়, তাহলেও রক্ত সংগীতের ধারায় আমি আমার গানকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেব।'

জয়তু কমরেড গদর! আপনাকে সালাম!

**গদরের গান**

**১.**

সালাম তোদের সালাম ওরে ও বাছনি তোদের
ওরে নির্ভীক ওরে নির্ভয় অসমসাহসী র‍্যাডিক্যাল
অসমসাহসী র‍্যাডিক্যাল তোরা বেঠবেগারের ছেলে
একে একে তোরা মাটির বিছানা তারাদের দেশে
সূর্য হয়ে উঠেছিস সূর্যের তেজে জ্বলে
দিশাহারা যারা ওরে ও বাছনি তোরা
তাদের জন্য জ্যোতিরথ ধ্রুবতারা

সালাম তোদের সালাম ওরে ও বাছনি তোদের

কাক যেই ডাকে পড়িমরি ছুটে দাঁড়াই দরজা খুলে
পাড়াপড়শিকে শুধোই খবর, থাকি আসা পথ চেয়ে
তোরা কি আসবি ওরে ও বাছনি কাকের ছানার বেশে
পেটে ধরবার আনন্দ কি পাব নবরূপে আগমনে

সালাম তোদের সালাম ওরে ও বাছনি তোদের

জোড়া চড়ুই আঙিনায় এলে এনে দিই খড়কুটো
একসঙ্গে দুটিতে থাকুক আমাদের চোখে চোখে
তোরা কি হবি চড়ুইয়ের ডিম ওরে বাছনি তোরা
ডিমের মধ্যে তোরা কি থাকবি আমাদের ছেলে হয়ে

সালাম তোদের ওরে ও বাছনি তোদের
(অংশবিশেষ)

**২.**

যে-হাতে চাষি লাঙল দিয়েছে
চটানে, তাতে কেন হাতকড়া
আজ তাতে কেন হাতকড়া

রক্ত জল করে কামিলারা
পোঁতে চারা, তারা কেন জেলে
আজ তারা কেন জেলে

কেন ভাই ছপটির দাগ
বোকাহাবাদের পিঠে
কেন ভাই কালশিটে

গ্রামে গ্রামে কেন এ লড়াই ভাই
মাঝরারে কেন এ নাকাড়া
কেপে ওঠে কেন পাড়া

কে মেশাল বিষ ভাই
ইঁদারার জলে
কে মেশাল বিষ

জনে জনে বলাৎকার
গ্রামের পর গ্রাম
এ কাদের কারবার
(অংশবিশেষ)

**জননাট্য মণ্ডলীর গান**

**১.**

ভারত আপনি মহান তুমি
ইসকি কাহানি শুনো রে ভাই
শির পে খাড়া হ্যায় বড়া হিমালয়
নদীয়া বহতি গঙ্গা যমুনা
ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী কৃষ্ণা
খাদান জঙ্গল পাহাড় আপনা
হরি ভরি আপনি ধরতি মে
উগলে মোতি নিকলে সোন
আনাজ সে ভণ্ডার ভরা হ্যায়
চিঁজো সে বাজার ভরা হ্যায়
ঘর ঘর মে মেহেমান আয়ে হে
সাথি উসকি ভুখা সোনা
আরে সুজলাং সুফলাং
ইসি দেশমে রোটি মহঙ্গী
কিউরে ভাই
হারে রেরে রেরে হাঃ

রুপয়ে মে যব আসসি পয়সা
খেতোঁ মে রাখতে হ্যায় ভরোসা
খেতে কো পানি সে ভরোসা
বাদল কি সব আহট সে দেখো
বাদল হরদম বে ভরোসা
কিষান কো যব খেত নেহি হ্যায়
সভী বড়ো কি হাথরে ভাই
খেত প্রধান ইস ভারত ভূমি মে
কিষান ভুখা কিঁউ রে ভাই–
হারে রেরে রেরে রেরে হাঃ
(অংশবিশেষ)

**২.**

একসাথ আয়েঙ্গে সংগঠন বনায়েঙ্গে
চলো রে চলো সাথি।

হম কষ্ট না উঠাতে, এহ খেতি নেহি বনতি
হম ধান না উগাতে, ওহ কোঠী নেহি ভরতি।
হম ভুখে প্যাসে কিঁউ হ্যায়।

ওহ খাকে মস্ত কিঁউ হ্যায়
আপনা পেট খালি হ্যায় উনকি রোজ দিয়ালি হ্যায়।
চলো রে চলো সাথি...
একসাথ আয়েঙ্গে...

ফ্যাক্টরি মে কষ্ট অপনা ওহ ফ্যাক্টরি কে মালিক
বঙ্গলে মে কষ্ট আপনা ওহ্ বঙ্গলে কে মালিক
বরবাদ হম হুয়ে হ্যায় ওহ্ আবাদি কে মালিক
হম্ জিন্দেগি জ্বলাই পর উনকো রোশনাই
সুরজ কো জাগানেবালে হামহি অন্ধেরে মে কিঁউ
চলো রে চলো সাথি।
একসাথ...।
যব রোড হম বানায়, গাড়ি উনকি চলতি
যব গাড়ি হম বানায়া তব চৈন উনকো মিলতি
যব চাবি হম্ বনাই, তিজোরি উনকি খুলতি।
যব খুন পসিনা আপনা, মেহনত মে জীনা আপনা
ওহ বনে হ্যাঁ মালামাল অপনি হাল বেহাল হ্যায়
চলো রে চলো সাথি
একসাথ...॥

ইয়ে জ্বলে হুয়ে হাথোঁ, হাতিয়ার উঠানা হোগা
ইয়ে ইনকিলাবি আঁখে, চিঙ্গার জ্বালানা হোগা।
ইহা খুন পসিনো সে বন্দুক চালানা হোগা।
লোহুঁ জিগর সে আপনা ঝাণ্ডা উঠানা হোগা,
জালিমো কে পঞ্জে সে দেশ কো বাঁচান হোগা,
চলো রে চলো সাথি
একসাথ...॥

***অমল আকাশ: শিল্পী ও লেখক। সমগীতের সংগঠক***
ইমেইল: amalsamageet@gmail.com

**তথ্যসূত্র :**

এবং জলার্ক, গদর সংখ্যা ২০০৫